রূপকথার এক রাজপুত্র

ইরানী বিশ্বাস

১৮ অক্টোবর। মধ্যরাত। ৭ বছরের রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে চট্টগ্রামে আছেন। মায়ের শরীর ভালো না। তাই বাড়িতে ফুপু এসেছেন। জামালের ঘুম ঘুম চোখ, হাসু-কামালের ঘুম নেই চোখে। দরজা খুলে এক গাল হেসে বড় ফুপু বললেন, হাসু... ও হাসু, তোমার ভাই হয়েছে।

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে মায়ের কাছে চলে যায় হাসু। একটা তুলতুলে নরম গালের ফুটফুটে শিশু হাসুর কোলে তুলে দেন ফুপু। ভেজা চুল ওড়না দিয়ে মুছে দিয়ে মনে হলো চুলগুলি চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিলে কেমন হয়। ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা চিরুনি হাতে নিতেই ফুপু বলে উঠলেন, ওর মাথাটা এখনো নরম, চিরুনি দিলে লাগবে।

নতুন শিশুটির আগমনে বাড়িজুড়ে যেন খুশির হাওয়া বইছে। বাবা শেখ মুজিব বাড়ি ফিরলেন। ছোট্ট সন্তানকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করে কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'ওর নাম রাখলাম রাসেল।' কারাগারের কঠিন সময়গুলোতে বঙ্গবন্ধুকে প্রিয় লেখক বার্ট্রান্ড রাসেলের বই শক্তি যোগাতো। তিনি মনে করেছিলেন আজকে জন্ম নেওয়া রাসেল তাকে বাকি দিনগুলোতে প্রেরণা যোগাবে। তাই প্রিয় লেখকের নামানুসারে প্রিয় পুত্রের নাম লাখলেন শেখ রাসেল।

ছোট্ট রাসেল ছিল শেখ পরিবারের জীবন্ত পুতুল। সকলের চোখের মণি, রূপকথার রাজপুত্র। বড় হতে হতে মা হয়ে উঠল রাসেলের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। তাঁর কাছেই যত আবদার, তাঁর সঙ্গেই যত অভিমান। কারণ জন্মের পর থেকে পিতাকে তেমন পায়নি। তবু যেটুকু পেয়েছে তাতেই তার অভ্যাস হয়েছিল ভোরে ঘুম ভাঙলে, আব্বার লম্বা শরীরে সে একটা ছোট্ট পাখির মতো জড়িয়ে থাকতো। একদিন সকালে সে ঘুম ভেঙে দেখে বিছানায় আব্বা নেই। আব্বাকে খুঁজতে সারা বাড়ি ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শেষ আশ্রয় খুঁজতে মায়ের কাছে গিয়ে আঁচল ধরে বসে থাকে। দেখে মায়ের চোখেও জল। মাকে দেখে আব্বা আব্বা বলে কাঁদতে শুরু করে। মমতাময়ী মা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ বাবা, আমিই তোমার আব্বা। তারপর থেকে রাসেল অনেকদিন মাকে কখনো 'মা' আবার কখনো 'আব্বা' বলে ডেকেছে।

রাসেল একটু বড় হয়েছে। আজ তার জন্মদিনে মা পায়েস রান্না করেছেন। সবাইকে খেতে দিতে দিতে বললেন, যেদিন তোমাদের আব্বা বাড়ি ফিরবেন, সেদিন খুব বড় করে রাসেলের জন্মদিন হবে। জন্মদিনে হাসু আপা একটা ছবির বই দিলেন, রেহানা রঙ পেন্সিল দিলেন, কামাল ছোট্ট খেলার বল দিলেন এবং জামাল ক্যামেরায় ছবি তুললেন। এভাবে বাবাকে ছাড়া রাসেলের জন্মদিন পালন হয়েছিল।

রাসেল প্রায়ই মায়ের সঙ্গে কারাগারে যায় আব্বাকে দেখতে। সেদিনও গিয়েছিল। খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আব্বার আসার পথের দিকে অধির আগ্রহে তাকিয়ে আছে। অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে অবশেষে রাসেল দেখতে পেল, তার আব্বা হেঁটে আসছে। সে দৌড়ে মাকে গিয়ে বলে, মা, আব্বা আসছে। তারপর আব্বা এসে রাসেলকে কোলে তুলে আদর করেন। আব্বা তার হাতে একটা লাল গোলাপ দিয়ে বলেন, এটা তোমার জন্মদিনের উপহার। রাসেল খুব খুশি হয়। আব্বার কাছে অনেক অভিযোগ করে বলে, সে রোজ স্কুলে যেতে চায়। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য মা তাকে বকেছে। গেটের সামনে বকুল তলায় সারাদিন ফুল ঝরে। আরো বলে, দাদি মোরগ-মুরগি পাঠিয়েছে, সেগুলো মা মুরগির খোপে রেখে দিয়েছে। একটা বড়ো লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগ খুব ভোরবেলায় ক-ক-ক করে ডেকে ঘুম ভাঙায়। মা বলেছে, ওই মোরগটা রাসেলের, ওটা খাওয়া যাবে না। সেদিন একটা মুরগি জবাই করতে দেখেছে সে। মুরগির লাল রক্ত দেখে তার চোখে অন্ধকার লাগছিল চারিদিক। ভয়ে বুক কাঁপছিল। ছোট্ট রাসেলের এসব কথা অবাক হয়ে শুনতে থাকেন আর ভীষণ মজা পান বঙ্গবন্ধু।

হঠাৎ একসময় রাসেল জিজ্ঞেস করে, আব্বা এটা কি তোমার বাড়ি? তুমি কেন এখানে থাকো? আব্বা হাসতে হাসতে জবাব দেন, হ্যাঁ বাবা, এটা আমার বাড়ি। কৌতূহলি হয়ে রাসেল জবাব দেয়, তাহলে আমিও তোমার বাড়িতে থাকবো। আব্বা তার কপালে চুমু খেয়ে আদর করে বলেন, না বাবা এখানে তোমার থাকা যায় না। তোমার বাড়িতে আমি শিগগিরই ফিরে আসবো। রাসেল তবু আবদার ধরে কাঁদতে থাকে, আমি তোমার বাড়িতে তোমার সাথে থাকবো। তোমার সাথে কথা বলবো, খেলবো আর তোমাকে জড়িয়ে ঘুমাবো। রাসেলের কথা শুনে, বঙ্গবন্ধুর চোখ সজল হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবেন, ছোটবেলায় তাঁরও আব্বার গলা ধরে না শুলে ঘুম আসতো না। রাসলে কি তার মতো হবে? তারপর তিনি রাসলেকে বোঝান, আমি খুব শিগগিরই চলে আসবো তোমার বাসায়। তুমি এখানে থাকলে তোমার মা'র চিন্তা হবে। তোমার জন্য কান্নাকাটি করবে। মাকে কষ্ট দিলে তুমি বড়ো হবে কী করে, বাবা? তুমি তো মা'র সঙ্গে থাকবে। রাসেল শান্ত হয়। কিন্তু চোখ মোছে বারবার। হাসু আপা তাকে কোলে তুলে নেয়, অভিমানে মলিন হয়ে থাকে মুখখানা।

কিছুদিন হলো রাসেল লক্ষ্য করে সারাবাড়ি কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মা আর কারাগারে আব্বাকে দেখতে যায় না। তাই রাসেলেরও যাওয়া হয় না। মায়ের মুখ কেমন থমথমে, মাঝে মাঝে ঘরে বসে মা কাঁদে। রাসেল একদিন মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, আব্বার কাছে যাবে না? মা কোনো উত্তর দেয় না। শুধু তাকে বুকের কাছে টেনে আদর করে। রাসেল আবার জিজ্ঞেস করে, মা আব্বার নাকি ফাঁসি হবে? ফাঁসি কি মা?

মা তাড়াতাড়ি রাসেল কে বুকে টেনে নিয়ে উত্তর দেয়, কে বলেছে তোমাকে এ কথা?

রাসেল উত্তর দেয়, সেদিন কাকা, দুলাভাই আর কামাল ভাই বলছিল, আমি শুনেছি মা।

তারপর আদর করে কাছে টেনে কাপালে চুমু খেয়ে বলেন, ছিঃ ওসব বলে না বাবা। দেখ, তোমার আব্বা বীরের বেশে ঘরে ফিরবেন। বাড়ির সামনে কত মানুষ আসবে। ঘরও ভরে যাবে। তোমার আব্বা দেশের মানুষকে কতো ভালো বাসেন, তারাই তাকে কারামুক্ত করে ঘরে ফিরিয়ে আনবে।

মায়ের কাছে বাবার জানা অজানা গল্প শুনতে শুনতে এক সময় সাড়ে চার বছরের রাসেল ঘুমিয়ে পড়ে।

বেঁচে থাকলে রাসেলের চেহারায় পৌঢ়ত্বের ছাপ পড়তো। মাথায় কাঁচাপাকা চুলের সাথে মুখে ভাঁজ পড়তো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমাও হয়তো থাকতো। বাবার মতো এরিনমোর তামাকের পাইপের বদলে হয়তো সিগারেট থাকতো। অথবা না-ও থাকতে পারতো। পরিবারের অন্য সব্বাইকে ছাড়িয়ে হয়তো তিনি হতেন প্রগাঢ় বুদ্ধিদীপ্ত চৌকস এক মহানায়ক। অথবা হতে পারতেন আজকের সফল রাষ্ট্রনায়ক। ছোট্ট রাসেলের মেধার কথা যখন বইয়ের পাতায় পড়ি তখন চোখের সামনে আবছা অবয়বে একটি মুখ ফুটে ওঠে। সেই মুখটি আর কেউ নয় যেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি। বাবার সফল উত্তর পুরুষ হতেন। বেঁচে থাকলে বাবার পরে সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে রাসেলই দেশের হাল ধরতেন।

অথবা, সেই ছোট্ট রাসেল হতে পারতেন মাহাকাশজয়ী কোনো নভোচারী। হতে পারতেন আজকের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের পথপ্রদর্শক। হতে পারতেন বিদেশে সমাদৃত বাংলাদেশি আবিষ্কারক। হতে পারতেন ধর্ম-মত ভেদাভেদহীন এক মহান পুরুষ। হতে পারতেন শান্তির পথপ্রদর্শক রূপকথার সেই আকাঙ্ক্ষিত রাজপুত্র।